বাঙ্গলার কথা

আজ বাঙ্গালীর মহাসভায় আমি বাঙ্গলার কথা বলিতে আসিয়াছি, আপনারা আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, আপনাদের আদেশ শিরোধার্য্য। আজ এই মিলনমন্দিরে আমার যোগ্যতা অযোগ্যতা লইয়া জটিল কুটিল অনেক প্রকারে বিচারের মধ্যে বিনাইয়া বিনাইয়া বিনয় প্রকাশ করিয়া আমার ও আপনাদের সময় অযথা নষ্ট করিব না। দেশের নায়ক হইবার অধিকারের যে অহঙ্কার, তাহা আমার নাই, কিন্তু আমার বাঙ্গলাকে আমি আশৈশব সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি। যৌবনে সকল চেষ্টার মধ্যে আমার সকল দৈন্য, সকল অযোগ্যতা অক্ষমতা সত্ত্বেও আমার বাঙ্গালার যে মূর্ত্তি, তাহা প্রাণে প্রাণে জাগাইয়া রাখিয়াছি, এবং আজ এই পরিণত বয়সে আমার মানসমন্দিরে সেই মোহিনী মূর্ত্তি আরও জাগ্রত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই যে আশৈশব ও আজীবন শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম ও ভালবাসা, তাহার অভিমান আমার আছে। সেই প্রেম জ্বলন্ত প্রদীপের মত আমাকে পথ দেখাইয়া দিবে। আপনাদের সকলের সমবেত যে যোগ্যতা, তাহাই আমাকে আশ্রয় করিয়া আমাকে যোগ্য করিয়া তুলিবে।

সেই ভরসায় আজ আমি আপনাদের সম্মুখে বাঙ্গালীর কথা বলিতে আসিয়াছি। যে কথাগুলি অনেক দিন ধরিয়া আমার প্রাণে জাগিয়াছে, যে সব কথা আমার জীবনের সকল রকমের চেষ্টা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে আরও ভাল করিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, যে কথাগুলিকে সত্য বলিয়া জীবনের ধ্যান-ধারণার বিষয় করিয়াছি, সে সব কথাগুলি আপনাদের কাছে নিবেদন করিব। যাহা সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে আমার কোন ভয় হয় না। লজ্জা হয় না। হয় ত আমাদের শাসনকর্ত্তাদের কাছে আমার অনেক কথা অপ্রিয় লাগিবে, হয় ত আমার অনেক কথার সঙ্গে আপনাদের অনেকের মনের মিল হইবে না। কিন্তু "সত্যম্ ব্রূয়াৎ প্রিয়ম্ ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যম্ অপ্রিয়ম্" এই বচনের এমন অর্থ নহে যে, যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, এবং যাহা প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা আছে, তাহা করিব না। সে ত কাপুরুষের কথা, দেশ-ভক্তের রীতি নহে। যে সত্য আমার হৃদয়ের মধ্যে জ্বলিতেছে, যাহাকে চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি, তাহাকে ঢাকিয়া রাখিতে হইলে যে পাটোয়ারী বুদ্ধির আবশ্যক, তাহা আমার নাই। আর নাই

বলিয়া তার জন্য কোনও অনুতাপও হয় না। তাই আজ যে কথাগুলি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, সেই কথাগুলি প্রিয়ই হউক, কি অপ্রিয়ই হউক, অম্লান বদনে অকুণ্ঠিতচিত্তে আপনাদের কাছে নিবেদন করিব।

প্রথমেই হয় ত অনেকেরই মনে হইবে যে এই মহাসভা শুধু রাজনৈতিক আলোচনার জন্য, এই সভায় বাঙ্গলার কথার আবশ্যক কি? এই প্রশ্নই আমাদের ব্যাধির একটি লক্ষণ। সমগ্র জীবনটাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিয়া লওয়া আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সাধনের স্বভাববিরুদ্ধ। আমরা ইউরোপ হইতে ধার করিয়া এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি, এবং এই ধার-করা জিনিস ভাল করিয়া বুঝি নাই বলিয়া আমাদের অনেক পরিশ্রম, অনেক চেষ্টাকে সার্থক করিতে পারি নাই। যে জিনিসটাকে আমরা রাজনীতি বা politics বলিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, তাহার সঙ্গে কি সমস্ত বাঙ্গলা দেশের সমগ্র বাঙ্গালী জাতির একটা সর্বাঙ্গীন সম্বন্ধ নাই? কেহ কি আমাকে বলিয়া দিতে পারে, আমাদের জাতীয় জীবনের কোন্ অংশটা রাজনীতির বিষয়, কোন্ অংশটা অর্থনীতির ভিত্তি, কোন্ অংশটা সমাজনীতির প্রাণ, আর কোন্ অংশটা ধর্ম্মসাধনার বস্তু? জীবনটাকে মনে মনে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া, এই সব জনগড়া জীবন-খণ্ডের মধ্যে কি আমরা অলঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলিয়া দিব? এই কাল্পনিক প্রাচীর-বেষ্টিত যে কাল্পনিক জীবন-খণ্ড, ইহারই মধ্যে কি আমাদের রাজনৈতিক আলোচনা বা সাধনা আবদ্ধ থাকিবে? আমাদের রাজনৈতিক আলোচনা বা আন্দোলনের যে বিষয়, তাহাকে কি বাঙ্গালী জাতির যে জীবন, সেই জীবনের সব দিক্ দিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব না? যদি না দেখি, তবে কি সত্যের সন্ধান পাইব?

কথাটা একটু তলাইয়া দেখিলে বেশ স্পষ্ট করিয়া বোঝা যায়। রাজনীতি কাহাকে বলে? এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কি? আমাদের সাধনায় ইহার কোন বিশিষ্ট নাম নাই, আমাদের পূর্বপুরুষগণ ইহার নামকরণ করার আবশ্যকতা মনে করেন নাই। ইউরোপীয় সাধনায় যাহাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে, তাহার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বলিতে গেলে রাজায় প্রজায় যে সম্বন্ধ, তাহা নির্ণয় করা এবং এই সম্বন্ধের মধ্যে যে একটা নিত্য সার্ব্বভৌমিক সত্য নিহিত আছে, তাহাকে প্রকাশ করা। ঐ মতে রাজনৈতিক আন্দোলন বা আলোচনার বিষয় কোন জাতির বা দেশের পক্ষে রাজা প্রজায় কি রকম সম্বন্ধ হওয়া উচিত, তাহাই বিচার করা। বাঙ্গলার রাজনৈতিক আন্দোলনের অর্থ এই যে, আমাদের দেশে রাজা প্রজায় যে সম্বন্ধ, তাহা পরীক্ষা করা ও কিরূপ হওয়া উচিত, তাহাই

বিচার করা। অর্থাৎ সমস্ত রাজ্যটা সদ্ভাবে ও সৎপথে চালনা করিতে হইলে যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা কতটা রাজার হাতে থাকিবে, কতটা প্রজার হাতে থাকিবে, তাহাই বিচার ও নির্ণয় করা।

কিন্তু ঐ যে রাষ্ট্রীয় চিন্তা বা চেষ্টা, ইহার সার্থকতা কোথায়? এক কথায় বলিতে হইলে, যে কথা অনেকবার শুনিয়াছি, তাহাই বলিতে হয়, বাঙ্গালীকে মানুষ করিয়া তোলা। বাঙ্গালী যে অমানুষ, তাহা আমি কিছুতেই স্বীকার করি না। আমি যে আপনাকে বাঙ্গালী বলিতে একটা অনির্ব্বচনীয় গর্ব্ব অনুভব করি, বাঙ্গালীর যে একটা নিজের সাধনা আছে, শাস্ত্র আছে, দর্শন আছে, কর্ম্ম আছে, ধর্ম্ম আছে, বীরত্ব আছে, ইতিহাস আছে, ভবিষ্যৎ আছে! বাঙ্গালীকে যে অমানুষ বলে, সে আমার বাঙ্গলাকে জানে না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়া যা'ক যে, বাঙ্গালীর কতকগুলা দোষ আছে, যাহার সংশোধন আবশ্যক এবং সেই ভাবে ধরিয়া লওয়া যা'ক যে বাঙ্গালী মানুষ। তাহাকে মানুষ করিয়া তোলাই রাষ্ট্রীয় চেষ্টা বা চিন্তার উদ্দেশ্য, এবং সেই জন্যই আমাদের দেশে রাজা প্রজায় যে সম্বন্ধ হওয়া উচিত, তাহা বিচার করা আবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশে রাজা প্রজায় কি সম্বন্ধ হওয়া উচিত, তাহা বিচার করিতে গেলে, আমাদের যে এখন ঠিক কি অবস্থা, তাহার বিচার করিতেই হইবে। সেই বিচার করিতে হইলে, আমাদের আর্থিক অবস্থা কিরূপ তাহা বিচার করিতেই হইবে। সেই বিচার করিতে হইলে, আমাদের চাষাদের চাষের সন্ধান লইতে হইবে। আমাদের চাষের সন্ধান ভাল করিয়া লইতে হইলে, আমাদের চাষ বাড়িতেছে কি কমিতেছে, তাহার খোঁজ রাখিতে হইবে। সেই কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে হইবে, কেন আমাদের পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া অনেক লোক সহরে আসিয়া বাস করে, সেই কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে বিচার করিতে হইবে যে, সে কি পল্লীগ্রামের অস্বাস্থ্যের জন্য, কি অন্য কোণ কারণে! সেই সঙ্গে সঙ্গে অস্বাস্থ্যের কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইবে। ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, রাজনীতির সাধন করিতে হইলে আমাদের চাষাদের অবস্থা চিন্তা করা আবশ্যক এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রামের অস্বাস্থ্যের কারণ অনুসন্ধান করাও আবশ্যক।

সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিচার করিতে হইবে, আমাদের দেশে যত চাষ-যোগ্য জমি আছে, সব ভাল করিয়া চাষ করিলেও আমাদের অবস্থা সহজ সচ্ছল

হয় কি না। যদি না হয়, তবে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা আলোচনা ও বিচার করিতে হইবে।

এই সব কথা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে আমাদের চাষের প্রণালী কিরূপ ছিল, আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা পূর্ব্বে কিরূপ ছিল, কেমন করিয়া গ্রামের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতাম, এ সব কথা তলাইয়া বুঝিতে হইবে।

শুধু তাহাই নহে, আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার কথা আলোচনা করিতে হইবে। কেমন করিয়া শিক্ষা বিস্তার করিতাম, কেমন করিয়া আমরা আপনাকে শিক্ষিত করিয়া লইতাম এবং এখন বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের শিক্ষা-প্রণালী কি রকম হওয়া উচিৎ, রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে এই সব কথারই বিচার আবশ্যক।

শুধু তাহাই নহে। আমাদের কৃষিকার্য, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে আমাদের সমাজের কি সম্বন্ধ ছিল এবং তাহাতে আমাদের কতটা উপকার, কতটা অপকার সাধিত হইতেছে, এ কথাকেও তাচ্ছিল্য করা যায় না। কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিতে পারিলে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় কি সম্বন্ধ থাকা উচিৎ, কিরূপে তাহার মীমাংসা হইবে? এই প্রশ্নের মীমাংসা যদি না করা যায়, তবে রাষ্ট্রীয় শক্তির কতটা রাজার হাতে কতটা আমাদের হাতে থাকা উচিৎ এই প্রশ্নের বিচারই বা কেমন করিয়া হইবে?

শুধু ইহাই নহে। আমাদের কৃষিকার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় সামাজিক ব্যবহার পর্য্যন্ত আমাদের সকল ভাবনা, সকল চেষ্টা ও সকল সাধনার সঙ্গে আমাদের ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ ছিল ও আছে, তাহার বিচার অবশ্য কর্ত্তব্য। সে দিকে চোখ না রাখিলে সব দিকই যে অন্ধকার দেখিব! সব প্রশ্নই যে অকারণে অস্বাভাবিকভাবে জটিল ও কঠিন হইয়া উঠিবে। সেই দিকে দৃষ্টি না রাখিলে কোন মীমাংসাই সম্ভবপর হইবে না।

আমাদের অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। কিন্তু আমাদের সব চেয়ে বেশী বিপদ যে, আমরা ক্রমশঃই আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহারে অনেকটা ইংরাজী ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। রাজনীতি বা Politcs শব্দটি শুনিবামাত্র আমাদের দৃষ্টি আমাদের দেশ একেবারে অতিক্রম করিয়া ইংলণ্ডে গিয়া পঁহুছায়। ইংরাজের ইতিহাসে এই রাজনীতি যে আকার ধারণ করিয়াছে, আমরা সেই মূর্ত্তিরই অর্চ্চনা করিয়া থাকি। বিলাতের জিনিসটা আমরা যেন একেবারে তুলিয়া আনিয়া এই দেশে লাগাইয়া দিতে পারিলেই বাঁচি। এ

দেশের মাটিতে তাহা বাড়িবে কি না, তাহা ত একবারও ভাবি না। Burke-এর ঝুলি যাহা স্কুলে কলেজে মুখস্থ করিয়াছিলাম, তাহাই আওড়াই, Gladstone-এর কথামৃত পান করি আর মনে করি, ইহাই রাজনৈতিক আন্দোলনের চরম। "Seely'র Expansion of England" নামে যে পুস্তক আছে, তাহা হইতে বাছা বাছা বচন উদ্ধার করি। Sidgwick এর কেতাব হইতে কথার ঝুড়ি টানিয়া বাহির করি, ফরাসী স্কুল, জার্ম্মাণ শুধু এবং ইউরোপে রাজনীতির যত স্কুল আছে, সব স্কুলের কেতাবে, কোরাণে যত ধারাল বাক্য আছে, একেবারে এক নিঃশ্বাসে মুখস্ত করিয়া ফেলি, আর মনে করি, এইবার আমরা বক্তৃতা ও তর্কে অজেয় হইলাম, দেখি আমাদের শাসনকর্ত্তারা কেমন করিয়া আমাদের তর্ক খণ্ডন করেন। মনে করি, রাজনৈতিক আন্দোলন শুধু তর্ক-বিতর্কের বিষয়—বক্তৃতার ব্যাপার মাত্র। আমরা তর্ক করিয়া, বক্তৃতা করিয়া জিতিয়া যাইব। আমাদের সকল উদ্যম ও সকল চেষ্টার উপরে আমাদের ধারকরা কথার ভার চাপাইয়া দিই। যাহা স্বভাবতঃ সহজ সরল, তাহাকে মিছামিছি বিনা কারণে জটিল করিয়া তুলি। শুধু যাহা আবশ্যক, তাহা করি না; দেশের প্রতি মুখ তুলিয়া চাই না, বাঙ্গলার কথা ভাবি না, আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসকে সর্ব্বতোভাবে তুচ্ছ করি। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার দিকে একেবারেই দৃক্‌পাত করি না। কাজেই আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন অসার, বস্তুহীন। তাই এই অবাস্তব আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রাণের যোগ নাই; এই কথা হয় ত অনেকে স্বীকার করিবেন না। কিন্তু স্বীকার না করিলেই কি কথাটা মিথ্যা হইয়া যাইবে? আমরা চোখ বুজিয়া থাকিলেই কি কেহ আমাদের দেখিতে পাইবে না? আমরা যে শিক্ষিত বলিয়া অহঙ্কার করি, আমরা দেশের কতটুকু স্থান অধিকার করিয়া থাকি? আমরা কয় জন? দেশের আপামর সাধারণের সঙ্গে আমাদের কোথায় যোগ? আমরা যাহা ভাবি, তাহারা কি তাই ভাবে? সত্য কথা বলিতে হইলে কি স্বীকার করিব না যে, আমাদের উপর আমাদের দেশবাসীর সেরূপ আস্থা নাই? কেন নাই? আমরা যে ভিতরে ভিতরে ইংরাজী ভাবাপন্ন হইয়াছি। আমরা যে ইংরাজী পড়ি ও ইংরাজীতে ভাবি, এবং ইংরাজী তর্জ্জমা করিয়া বাঙ্গলা বলি ও লিখি, তাহারা যে আমাদের কথা বুঝিতে পারে না। তাহারা মনে করে, নকলের চেয়ে আসলই ভাল। আমরা যে তাহাদের ঘৃণা করি। কোন্ কাজে তাহাদের ডাকি? Government এর কাছে কোনও আবেদন করিতে হইলে

তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া একটা বিরাট সভার আয়োজন করি, কিন্তু সমস্ত প্রাণ দিয়া কোন্ কাজে তাহাদের ডাকি? আমাদের কোন্ কমিটিতে, কোন্ সমিতিতে চাষা সভ্য-শ্রেণীভুক্ত? কোন্ কাজ তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহাদের মত লইয়া করি? যদি না করি, তবে কেন অবনতমস্তকে আমাদের ত্রুটি স্বীকার করিব না? কেন সত্য কথা বলিব না? মিথ্যার উপর কোনও সত্য বা সত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের যে রাজনৈতিক আন্দোলন, ইহা একটা প্রাণহীন, বস্তুহীন, অলীক ব্যাপার। ইহাকে সত্য করিয়া গড়িতে হইলে বাঙ্গলার সব দিক দিয়াই দেখিতে হইবে। বাঙ্গলার যে প্রাণ, তাহারই উপর ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাই বলিতেছিলাম, আজ এই মহাসভায় আমি বাঙ্গলার কথা বলিতে আসিয়াছি।

কিন্তু আমি যে বিপদের কথা বলিয়াছি, তাহার জন্য নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই। আমাদের এ অবস্থা প্রকৃতপক্ষে অস্বাভাবিক হইলেও ইহার যথাযথ কারণ আছে। ইংরাজ যখন প্রথমে আমাদের এদেশে আসে, তখন নানা কারণে আমাদের জাতীয় জীবন দুর্ব্বলতার আধার হইয়াছিল। তখন আমাদের ধর্ম্ম একেবারেই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। একদিকে চিরপুরাতন চিরশক্তির আকর সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কেবলমাত্র মৌখিক আবৃত্তি ও আড়ম্বরের মধ্যে আপনার শিব-শক্তিকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল; অপর দিকে যে অপূর্ব্ব প্রেমধর্ম্মবলে মহাপ্রভু সমস্ত বাঙ্গলা দেশকে জয় করিয়াছিলেন, সেই প্রেম-ধর্ম্মের অনন্ত মহিমা ও প্রাণসঞ্চারিণী শক্তি কেবলমাত্র তিলক-কাটা ও মালা-ঠকঠকানিতেই নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছিল। বাঙ্গলার হিন্দুর সমগ্র ধর্ম্মক্ষেত্র শক্তিহীন শাক্ত ও প্রেম-শূন্য বৈষ্ণবের ধর্ম্মশূন্য কলহে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তখন নবদ্বীপের চিরকীর্ত্তিময় জ্ঞান-গৌরব কেবলমাত্র ইতিহাসের কথা—অতীত কাহিনী। বাঙ্গালী জীবনের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। এইরূপে কি ধর্ম্মে, কি জ্ঞানে বাঙ্গলার হিন্দু তখন সর্ব্ববিষয়ে প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল। আলিবর্দ্দি খাঁর পর হইতেই বাঙ্গলার মুসলমানও ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল এবং এই সময় তাহাদের সকল জ্ঞান ও সকল শক্তি বলহীনের বিলাসে ভাসিয়া গিয়াছিল। এমন সময় সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ইংরাজ বণিক-বেশে আগমন করিল এবং অল্প দিনের মধ্যেই রাজত্ব স্থাপন করিয়া অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিল। আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতানিবন্ধন আমরা ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইংরাজ জাতিকে ও তাহাদের সভ্যতা ও তাহাদের বিলাসকে বরণ করিয়া লইলাম। দুর্ব্বলের যাহা হয়, তাহাই হইল।

ইংরাজী সভ্যতার সেই প্রখর আলোক সংযতভাবে ধারণ করিতে পারিলাম না। অন্ধ হইয়া পড়িলাম। অন্ধকারাক্রান্ত দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক যেমন বিস্ময়ে ও মোহ বশতঃ আপনার পদপ্রান্তস্থিত সুপথকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া, বহুদূর দুর্গম পথকে সহজ ও সন্নিকট মনে করিয়া, সেই পথেই অগ্রসর হয়, আমরাও ঠিক সেইরূপ নিজের ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া নিজের শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া, নিজের সাহিত্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া, আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ইঙ্গিতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া ইংরাজের সাহিত্য, ইংরাজের ইতিহাস, ইংরাজের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দিকে নিতান্ত অসংযতভাবে ঝুঁকিয়া পড়িলাম। সেই ঝোঁক অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও একেবারে যায় নাই। রামমোহন যে দেশে "বিজ্ঞানের তূর্য্যধ্বনি" করিয়াছিলেন, আমরা তাহাই শুনিয়াছিলাম বা মনে করিয়াছিলাম শুনিয়াছি, অন্ততঃপক্ষে বিজ্ঞানের বুলি আওড়াইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু রামমোহন যে গভীর শাস্ত্রালোচনায় জীবনটাকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাহার দিকে ত আমাদের চোখ পড়ে নাই। তিনি যে আমাদের সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে আমাদের উদ্ধারের পথ খুঁজিয়াছিলেন, সে কথা ত আমরা একবারও মনে করি নাই। তার পর দিন গেল। আমাদের স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল, আমাদের ঝোঁকটা আরও বাড়িয়া গেল। তারপর বঙ্কিম সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গলার মূর্ত্তি গড়িলেন,—প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন। বঙ্গজননীকে দর্শন করিলেন। সেই "সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্" তাহারই গান গাহিলেন। সবাইকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, দেখ, এই আমাদের মা, বরণ করিয়া ঘরে তোল।" কিন্তু আমরা ত তখন সে মূর্ত্তি দেখিলাম না; সে গান শুনিলাম না। তাই বঙ্কিম আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি একা মা মা বলিয়া রোদন করিতেছি।" তারপর শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের আন্দোলন। এই আন্দোলন সম্বন্ধে আমাদের দেশে অনেক মতভেদ আছে। কেহ বলেন, উহা আমাদের দেশের অনেক অনিষ্ট করিয়াছিল, আবার কেহ কেহ বলেন উহা আমাদের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছিল। সে সব কথা লইয়া আলোচনা করা আমি আবশ্যক মনে করি না। এই আন্দোলন যে অনেক দিকে একেবারেই অন্ধ ছিল, তাহা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু আমি যেন সেই আন্দোলনের মধ্যেই বাঙ্গালী জাতির, অন্ততঃপক্ষে শিক্ষিত বাঙ্গালীর আত্মস্থ হইবার একটা প্রয়াস—একটা উদ্যম দেখিতে পাই। সেইটুকুই আমাদের লাভ। তারপর আরও দিন গেল। ১৯০৩ খৃঃ হইতে স্বদেশী আন্দোলনের

বাজনা বাজিতে লাগিল। বাঙ্গালী আপনাকে চিনিতে ও বুঝিতে আরম্ভ করিল। রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন—

"বাংলার মাটি বাংলার জল
সত্য কর সত্য কর হে ভগবান্।"

বাঙ্গলার জল বাঙ্গলার মাটি আপনাকে সার্থক করিতে লাগিল।

কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেক জ্ঞানী গুণী মহাপণ্ডিত আছেন, যাঁহারা নাকি বলেন যে, এই স্বদেশী আন্দোলন ইহা একটা বৃহৎ ভ্রান্তির ব্যাপার। আমরা নাকি সব দিকে ঠিক হিসাব করিয়া চলিতে পারি নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের দেশে একটা প্রাণহীন জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে। এই মুখস্ত করা জ্ঞানের ক্ষমতা অল্পই; কিন্তু অহঙ্কার অনেকখানি। এই জ্ঞানে যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা সব জিনিস সের দাঁড়ি লইয়া মাপিতে বসেন। তাঁহারা অঙ্কশাস্ত্রের শাস্ত্রী, সব জিনিস লইয়া আঁক কষিতে বসেন। কিন্তু প্রাণের যে বন্যা, সে ত অঙ্ক-শাস্ত্র মানে না, সে যে সকল মাপকাটী ভাসাইয়া লইয়া যায়। স্বদেশী আন্দোলন একটা ঝড়ের মত বহিয়া গিয়াছিল, একটা প্রবল বন্যায় আমাদের ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। প্রাণ যখন জাগে, তখন ত হিসাব করিয়া জাগে না। মানুষ যখন জন্মায়, সে ত হিসাব করিয়া জন্মায় না বা জন্মাইতে পারে না বলিয়াই সে জন্মায়। আর না জাগিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই প্রাণ একদিন অকস্মাৎ জাগিয়া উঠে। এই যে মহাবন্যার কথা বলিলাম, তাহাতে আমরা ভাসিয়া—ডুবিয়া, বাঁচিয়াছি। বাঙ্গলার যে জীবন্ত প্রাণ, তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। বাঙ্গলার প্রাণে প্রাণে আবহমান যে সভ্যতা ও সাধনার স্রোত, তাহাতে অবগাহন করিয়াছি। বাঙ্গলার যে ইতিহাসের ধারা, তাহাকে কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। বৌদ্ধের বুদ্ধ, শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের ভক্তি, সবই যেন চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতির গান মনে পড়িল। মহাপ্রভুর জীবন-গৌরব আমাদের প্রাণের গৌরব বাড়াইয়া দিল। জ্ঞানদাসের গান, গোবিন্দদাসের গান, লোচন-দাসের গান, সবই যেন একসঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিল। কবিওয়ালাদের গানের ধ্বনি প্রাণের মধ্যে বাজিতে লাগিল। রামপ্রসাদের সাধনসঙ্গীতে আমরা মজিলাম। বুঝিলাম, কেন ইংরাজ এ দেশে আসিল, বুঝিলাম রামমোহনের তপস্যার নিগূঢ় মর্ম্ম কি? বঙ্কিমের যে ধ্যানের মূর্ত্তি সেই—

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম

ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে—"

সেই মাকে দেখিলাম। বঙ্কিমের গান আমাদের "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল।" বুঝিলাম, রামকৃষ্ণের সাধনা কি—সিদ্ধি কোথায়! বুঝিলাম, কেশবচন্দ্র কেন কাহার ডাক শুনিয়া ধর্ম্মের তর্করাজ্য ছাড়িয়া মর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের বাণীতে প্রাণ ভরিয়া উঠিল! বুঝিলাম, বাঙ্গালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খৃষ্টান হউক, বাঙ্গালী বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম আছে। এই জগতের মাঝে বাঙ্গালীর একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, কর্ত্তব্য আছে। বুঝিলাম, বাঙ্গালীকে প্রকৃত বাঙ্গালী হইতে হইবে। বিশ্ববিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙ্গালী সেই সৃষ্টিস্রোতের মধ্যে এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। অনন্তরূপ লীলাধারের রূপবৈচিত্র্যে বাঙ্গালী একটি বিশিষ্টরূপ হইয়া ফুটিয়াছে। আমার বাঙ্গলা সেই রূপের মূর্ত্তি; আমার বাঙ্গলা সেই বিশিষ্টরূপের প্রাণ। যখন জাগিলাম, মা আমার আপন গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন। সে রূপে প্রাণ ডুবিয়া গেল। দেখিলাম, সে রূপ বিশিষ্ট, সে অনন্ত! তোমরা হিসাব করিতে হয় কর, তর্ক করিতে চাও কর—আমি সে রূপের বালাই লইয়া মরি।

স্বদেশী আন্দোলন হিসাব না করিয়াই আসিয়াছিল, হিসাব না করিয়াই চলিয়া গেল। কিন্তু এখন আমাদের হিসাব করিবার সময় আসিয়াছে, মা দেখা দিয়াছেন— এখন যে পূজার আয়োজন করিতে হইবে। হিসাব করিয়া ফর্দ্দ তৈয়ারী করিতে হইবে, হিসাব করিয়া পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। এই যে মহা বন্যায় দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল, এখন যে সব পতিত জমি আবাদ করিয়া সোনা ফলাইতে হইবে। বিশ্বাস রাখিও, সোনা ফলিবেই।

এখন আমাদের বিচার্য্য যে, কেমন করিয়া এই নব-জাগ্রত বাঙ্গালী জাতিকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া তুলিতে পারি। সেই কারণে সেই দিক্ দিয়াই দেখিতে হইবে, আমাদের বিকাশের জন্য কি কি আবশ্যক এবং তাহা কি করিয়া পাইতে পারি।

এই বিচার লইয়াই সম্প্রতি একটা গোল বাধিয়াছে। ইউরোপে নাকি কোন কোন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, এই যে জাতিগত ভাব—ইংরাজীতে

যাহাকে "Nation Idea" বলে, ইহা নাকি একেবারেই কাল্পনিক, কোন বস্তুর উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। কোন বিশিষ্ট জাতির নাকি কোন একটা স্বতন্ত্র মূল্য নাই। প্রত্যেক জাতির রক্তের মধ্যে অন্যান্য জাতির রক্ত মিশ্রিত আছে। আচার-ব্যবহারে, শিক্ষায় দীক্ষায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে সকল বিষয়েই ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে আদান-প্রদান চলিয়াছে এবং এই আদান-প্রদানের মধ্যে যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা কোন বিশিষ্ট জাতির জাতিত্বের ফল নহে; এই জাতিত্বের ভাব পোষণ করিলে নাকি জাতিতে জাতিতে সংগ্রাম ও সংঘর্ষ বাড়িয়া যাইবে ও সমগ্র মানবজাতির অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠিবে। কথাটি অনেকদিনকার কিন্তু বর্ত্তমান যুগের সঙ্গে সঙ্গেই আবার নূতন করিয়া প্রচারিত হইতেছে, কাজেই আমাদের দেশেও দুই একজন পণ্ডিত তাহা ধরিয়া বসিয়াছেন, এবং এই মতের জোরেই আমাদের এই নব-জাগ্রত জাতীয় জীবনাকাঙ্খাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইউরোপের এই মত ইউরোপে অনেক বড় বড় পণ্ডিত অনেকবার খণ্ডন করিয়াছেন; আমি ভরসা করি, এবারও করিবেন। তাঁহাদের সমস্যা তাঁহারাই পূরণ করিবেন। কিন্তু সূর্য্যের চেয়ে বালীর তাপ বেশী; আমাদের দেশে এই সব নকল পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য এত বেশী যে, তাহাদের কোন মতকে কিছুতেই খণ্ডন করা যায় না! এমন কি, যে রবীন্দ্রনাথ সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জলকে সত্য করিবার কামনায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথ এখন স্যার রবীন্দ্রনাথ—এবার আমেরিকায় ঐ মতটি নাকি খুব জোরের সঙ্গে জাহির করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত বক্তৃতাটি কোন কাগজে প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং পড়িতে পারি নাই, Modern Review তে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পড়িয়াছি, হয় ত সমস্ত না পড়িতে পাইয়া তাঁহার মতের সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়াছি, কিন্তু যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, সেই মতের, এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালী জাতির এই মহাসভায় সভাপতির আসন হইতে প্রতিবাদ হওয়া উচিত মনে করি।

এই সমস্ত মতটাই বস্তুহীন, বিশ্বমানবের ছায়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত মানবজাতির মধ্যে সত্য ভ্রাতৃভাব জাগাইতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন জাতিসমূহকে বিকশিত করিতে হইবে। তাহার পূর্ব্বে এই ভ্রাতৃভাব অসার কল্পনা মাত্র। জাতি তুলিয়া দিলে বিশ্বমানব দাঁড়াইবে কোথায়? যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির বিকাশ না হইলে একটি পরিবারের উন্নতি হয় না, যেমন পরিবার সমূহের উন্নতি না হইলে সমাজের উন্নতি হয় না, যেমন সমাজের উন্নতি না হইলে

জাতির উন্নতি হয় না, ঠিক তেমনি সেই একই কারণে সকল ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্ট জাতির উন্নতি না হইলে সমগ্র মানবজাতির উন্নতি হয় না। বাঙ্গালীর শিরায় শিরায় যে রক্তই প্রবাহিত হউক না কেন, সে রক্ত আর্য্যই হউক, কি অনার্য্যই হউক, কি আর্য্য অনার্য্যের মিশ্রিত রক্তই হউক, যাহা সত্য, তাহা সত্যকামের মত স্বীকার করিতে বাঙ্গালী কখনও কুণ্ঠিত হইবে না—বাঙ্গালীর শিরায় শিরায় যে রক্তই প্রবাহিত হউক না কেন, বাঙ্গালী যে বাঙ্গালী, সে কথা আর ত সে ভুলিতে পারে না, সে যে বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জলে বাড়িয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জলের সঙ্গে নিত্যই যে তাহার আদান-প্রদান চলিতেছে। আর সেই আদান-প্রদানের মধ্যে যে একটা নিত্য সত্য জাগ্রত সম্বন্ধের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সম্বন্ধের উপর বাঙ্গলার জাতিত্বের প্রতিষ্ঠা। অন্যান্য জাতির সহিত ব্যবসাবাণিজ্য শিক্ষা-দীক্ষার যে আদান-প্রদান, তাহাও এই জাতিত্বের লক্ষণ। জাতিত্বের গুণেই এক জাতি দান করিতেও সক্ষম হয়, গ্রহণ করিতেও সক্ষম হয়। ইহা সেই জাতির অবস্থার বিষয়, স্বভাবের বিষয়। তার পর বিরোধের কথা, জাতিত্বের প্রভাবে যে কতকটা বিরোধ জাগিয়া উঠে, তাহা অস্বীকার করা চলে না। সেও যে জাতির স্বভাবের ধর্ম্ম, তা বলিয়াই জাতিগুলাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। প্রত্যেক পরিবারমধ্যে প্রত্যেক সমাজে বিরোধ-বিসংবাদ ত লাগিয়াই আছে, তা বলিয়াই কি সেই ব্যক্তিগুলার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে, না উড়াইয়া দিতে হইবে? শত প্রকারের বিরোধ-বাদ-বিসংবাদের মধ্যেই মানুষ মানুষ হইয়া উঠে ও মিলনের পথ খুঁজিয়া পায়। এই যে সব বিশিষ্ট জাতিসমূহ, ইহাদের পক্ষে ঐ একই কথা খাটে। এই বিরোধ-বিসংবাদ সংঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেই এই সব বিশিষ্ট জাতি সমস্ত মানবজাতির যে মিলন-মন্দির, সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে ও হইবে।

সংসারে প্রত্যেক জিনিসের প্রত্যেক ভাবের দুইটা মুখ আছে, এই যে বাদবিসংবাদ ইহারও দুইটা মুখ। আমরা এক মুখ দেখি, আর এক মুখ দেখি না। বিরোধ আছে চক্ষে দেখিতেছি, মনে জানিতেছি, ইহাকে অস্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু এই বিরোধেরই অপর মুখে যে মিলন, তাহা দেখিতে পাই না বলিয়া অস্বীকার করিয়া থাকি। ইউরোপে আজ যে ভীষণ সমরানল প্রজ্জলিত, এই অনলে ইউরোপের সকল ঈর্ষা, বিদ্বেষ, দৈন্য, অপার শক্তির অভিমানজনিত যে হীনতা, অসীম স্বার্থপরতার যে মলিনতা, সব পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। আমি দেখিতেছি, চক্ষে স্পষ্ট দেখিতেছি, এই পবিত্র ভষ্ম-

সমাধির উপরে ইউরোপ তাহার মিলন-মন্দির রচনা করিতেছে। সকল প্রকার হীনতা ও স্বার্থপরতার ধর্ম্মই এই যে, সে নিজের আবেগে নিজের বিনাশ-সাধন করে এবং সেই বিনাশের মুখে পরমানুরক্তি জাগাইয়া দেয়। সেই পরমানুরক্তি না জাগিলে যথার্থ মিলন অসম্ভব। অনেকে হয় ত মনে করেন, এই যে কলিযুগের কুরুক্ষেত্র, ইহাতে ইউরোপের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। আমি বলি, কখনও না। সকল যুদ্ধক্ষেত্র যে ধর্ম্মক্ষেত্র, সকল ইতিহাস যে ভগবৎ-লীলার পূত পুণ্য কাহিনী, ভারতের কুরুক্ষেত্রের ফলে কি তখনকার ভারত মিলনপথে অগ্রসর হয় নাই? নবজীবন লাভ করে নাই? আর্য্য অনার্য্যের মধ্যে কি একটা স্বাভাবিক মিলন সংঘটিত হয় নাই? আমরা অমঙ্গলের দিকটাই দেখি, কিন্তু তাহার সঙ্গে জড়িত যে মঙ্গল, সেই দিক দেখিতে ভুলিয়া যাই।

ইউরোপ আজ অসীম দুঃখ-কষ্ট, যাতনা-বেদনা, অর্দ্ধ-অনশনের মধ্যেই মিলনপথে পা বাড়াইয়াছে। অহঙ্কারের অবসান না হইলে প্রেমের জন্ম হয় না। এই দুঃখ-কষ্ট আজ ইউরোপকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে, ইহা সেই প্রেম-মিলনের আগমনপ্রতীক্ষার প্রসববেদনা। এই সমরানল নির্ব্বাপিত হইলে দেখিতে পাইবে, ইউরোপ আপনার স্বার্থপরতাকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বাস করিও, একদিন দেখিবে, যে প্রবল অপ্রতিহত বেগে ইউরোপ আজ তাহার স্বার্থ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে এবং সমস্ত প্রাণপণ দিয়া সেই স্বার্থ-পরতাকেই পোষণ করিতেছে, সেই ইউরোপ তেমনি অপ্রতিহত বেগে ঠিক সেই রকম সমস্ত প্রাণপণ দিয়া সে নিজের ও জগতের যথার্থ মঙ্গল সাধন করিতেছে। এই সমর, এই বিরোধ যে জাতিত্বের ফল, তাহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু এই সমরক্ষেত্রের অপর পারে যে মিলনমন্দির রচিত হইতেছে, তাহাও এই জাতিত্বেরই ফল, সে কথা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? যদি কোন দিন সুদূর ভবিষ্যতে সমস্ত মানবজাতি লইয়া একটা যুক্তরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, তখন সমস্ত বিশিষ্ট জাতিগুলি নিজ নিজ স্বভাব-ধর্ম্মের পথ অবলম্বন করিয়া অপূর্ব্বরূপে বিকশিত হইয়াছে এবং সেই যুক্তরাজ্যে সকল জাতিরই সমান অধিকার। কিন্তু আমার মনে হয়, এই বিশিষ্ট জাতি-সমূহ সেই অবস্থায় উপস্থিত হইলে সমস্ত মানবজাতির কল্যাণের জন্য কোন রাজত্বেরই আবশ্যক হইবে না।

এই যে বাঙ্গালী জাতির জাতিত্বের দাবী, ইহার সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথার আলোচনা আবশ্যক। আমি এমন কথা শুনিয়াছি—আমার কাছেই

অনেকে বলিয়াছেন যে—আমাদের পক্ষে জাতিত্বের গৌরব করা নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ, এই যে জাতিত্বের ভাব, ইহার সমস্তই আগাগোড়া বিলাতের আমদানি —একটা ধার করা সামগ্রী মাত্র। এটা যে তাঁদের ভুল, তাহা আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আমি আগেই বলিয়াছি, কোন একটা বিশিষ্ট দেশের সঙ্গে সেই দেশবাসীদের যে নিত্যসম্বন্ধ, তাহারই উপরে জাতিত্বের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, এ সম্বন্ধ যাহা নিত্য আবহমান কাল হইতে আছে ও চিরদিনই থাকিবে, তাহার প্রতি এতকাল এমতভাবে আমাদের চোখ পড়ে নাই ; হইতে পারে, আমাদের সভ্যতায় ও সাধনায় এই সম্বন্ধে কোন বিশিষ্ট নাম রাখা হয় নাই ; ইহাও হইতে পারে, ইউরোপের সভ্যতা ও সাধনা, তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা, বিজ্ঞান, ইতিহাস লইয়া এমন করিয়া হুড়মুড় করিয়া আমাদের ঘাড়ের উপর না পড়িলে, হয় ত এত সহজে এত শীঘ্র আমাদের জাতিত্বের চৈতন্য হইত না— তাহা বলিয়া কি যাহা আমাদের, আমাদেরই দেশের, যাহা বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জলের সঙ্গে অণুতে অণুতে প্রাণে প্রাণে জড়াইয়া আছে, তাহাকে বিলাতের আমদানি বলিয়া সমস্ত বাঙ্গালীজাতিকে অপমান করিব? যাহা চিরকাল আছে, তাহাকে দেখিতে পাই নাই, বুঝিতে পারি নাই বলিয়া কি ধরিয়া লইতে হইবে যে, তাহার কোন অস্তিত্ব ছিল না? বিজ্ঞান জগতে যে বড় বড় সত্য আবিষ্কার হইয়াছে, সে সব সত্যই যে সনাতন—তাহাদের সত্তা বা অস্তিত্ব ত কোন বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানবিদের উপরে নির্ভর করে না? মাধ্যাকর্ষণ যেমন নিউটনের জন্মাইবার আগেও ছিল, আমাদের জাতির জাতিত্ব তেমনি ইংরাজ আসিবার আগেও ছিল। আমরা দেখিতে পাই নাই বলিয়া যে ছিল না তাহা নহে। ইউরোপ হইতে একটা বিপরীত সভ্যতা আসিয়া আমাদের জীবনে আঘাত করিল, সে আঘাতে আমাদের চৈতন্য হইল, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের জাতির যে জাতিত্ব, তাহার সাক্ষাৎ পাইলাম। এমন করিয়াই মনুষ্যজীবনে আত্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়, বাহিরের রূপ ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া আত্মাকে আঘাত করে, সেই আঘাতেরই ফলে আমরা আপনাকে দেখিতে পাই, কিন্তু যাহা দেখি তাহা ত বাহিরের নয়, তাহা আমাদের প্রাণের বস্তু। আমাদের নবজাগ্রত বাঙ্গালী জাতির যে জাতিত্ব, তাহা আমাদের প্রাণবস্তু, বিদেশের নহে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ভগবৎ-কৃপায় আমাদেরই প্রাণের মধ্যে তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি—তাহাকে ধার করিয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার করিয়া লইয়া আসি নাই।

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথার বিচার ও আলোচনার আবশ্যক।

আমরা কথায় কথায় বলিয়া থাকি, আমাদের দেশে ইংরাজের আগমন বিধির বিধান। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ১৯১৫ খৃঃ অব্দের কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে এই কথাই বলিয়াছেন—এই কথার গূঢ় মর্ম্ম কি তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। এই কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা বলিয়া থাকি। এই দুইটি কথাই মূলে এক কথা। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন সম্ভবপর কিনা, এই বিষয়ে যে অনেক মতভেদ আছে। সেই সব ভিন্ন ভিন্ন মতের মর্ম্ম কথাটি কি, তাহা তলাইয়া বুঝিলে জাতির জাতিত্বের কথা আরও পরিষ্কার হইয়া উঠিবে। Keepling লিখিয়াছিলেন—"The East is East and the West is West, never the twain shall meet." অর্থাৎ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিরকালই ভিন্ন ভিন্ন থাকিবে, তাহাদের মিলন অসম্ভব।

আবার বিলাতে ও আমাদের দেশে এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা বলেন যে, এই মিলন একেবারে অবশ্যম্ভাবী। স্যার রবীন্দ্রনাথ এবার আমেরিকায় বলিয়াছেন যে, জাতির বদলে একটা Universal brotherhood of mankind হইবে অর্থাৎ সমস্ত মানবজাতি ভ্রাতৃভাবে একত্র হইবে। বোম্বাইএর কংগ্রেসে স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন বলিয়াছেন :—

"Ths East and the West have met—not in vain. The invisible scribe, who has been writing the most marvellous history that has ever been written, has not been idle. Those who have the discernment and the inner vision to see will note that there is only one goal, there is only one path.

অর্থাৎ—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন ব্যর্থ হয় নাই, যে অদৃশ্য বিধাতাপুরুষ এতাবৎকাল পর্য্যন্ত রচিত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে আশ্চর্য্য লেখা লিখিতেছেন, তিনি ত নিশ্চিন্ত হইয়া নাই। যাঁহাদের বিচারবুদ্ধি ও দিব্যচক্ষু আছে, তাঁহারা বলিতেন যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের একই ইষ্ট, একই পন্থা। এই বিষয়ে আমি যতই চিন্তা করি, মনে হয়, এই দুইটা কথা সত্য, আবার দুইটা কথাই মিথ্যা, ইহার কোনটাই একেবারে সত্য নয়। দুইটা একেবারে বিপরীত রকমের সভ্যতা ও সাধনা লইয়া এই যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, ইহাদের মধ্যে মিলনের সম্ভাবনা কোথায়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বদলে আমি ইংলণ্ড ও বাঙ্গলা দেশ ধরিয়া লই, তাহা হইলে কথাটা অনেক পরিমাণে সরল হইয়া আসিবে। এই

মিলন কত প্রকারে হইতে পারে, তাহা বিচার করা যা'ক। আমাদের ও ইংরাজের মিলনের মর্ম্ম যদি এই হয় যে, আমরা ইংরাজের ইতিহাসের সাহায্যে সেই ছাঁচে গড়িয়া উঠিব অর্থাৎ বাঙ্গলা দেশটা একটা নকল ইংলণ্ড হইবে, আমাদের নরনারী নকল সাহেব মেম হইয়া উঠিবে, আমাদের শিক্ষাপ্রণালী ঠিক হুবহু বিলাতের মত হইবে, আমাদের চাষবাস ব্যবসা-বাণিজ্যের চেষ্টায় সমস্ত দেশটাই যথার্থ গৃহস্থের আশ্রম না হইয়া একটা বৃহৎ ভীষণ কলের কারখানা হইয়া উঠিবে, তাহা হইলে আমি বলি, মিলন একেবারে অসম্ভব। অনেকে হয় ত বলিবেন, কেন অসম্ভব?

এই সহরে ত অনেকেই ইংরাজী রকমে জীবন যাপন করেন। আহার বিহার, আচারে ব্যবহারে চালচলনে ইংরাজের সহিত তাঁহাদের কোন পার্থক্যই দেখা যায় না। কলিকাতায় আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য ত একরকম বিলাতের ছাঁচেই ঢালা, আর কলিকাতায় যাহা দেখা যায়, তাহা যে ক্রমশঃ দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তবে কেমন করিয়া বলা যায় যে, আমরা আমাদের বিলাতের ছাঁচে গড়িয়া উঠিব না? আমার কথা এই যে, নকল সাজা সহজ, কিন্তু যথার্থ নকল হওয়া বড়ই কঠিন। সাজা জিনিসটা খেয়ালের ব্যাপার, একদিন থাকে, তার পর থাকে না; কিন্তু হওয়া জিনিসটার সঙ্গে রক্তমাংসের সম্বন্ধ আছে, কোন একটা জাতিকে কিছু হইতে হইলে তাহার স্বভাবধর্ম্মে সেই হওয়া জিনিসটার বীজ থাকা চাই। আমার কিছুতেই মনে হয় না, বাঙ্গালীর স্বভাবধর্ম্মের মধ্যে ইংলণ্ডের সভ্যতা ও সাধনার বীজ আছে, সুতরাং এই অর্থে ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মিলন অসম্ভব, এবং এইভাবে দেখিতে গেলে Keepling এর কথাই ঠিক বলিয়া মনে হয়, প্রাচ্য প্রাচ্যই থাকিবে, প্রতীচ্য প্রতীচ্যই থাকিবে. ইহারা কখনও মিলিবে না।

তবে কি এই দুইটা জাতি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নিজ নিজ সত্তা হারাইয়া একটা নূতন রকমের দোআঁসলা জাতি গড়িয়া উঠিবে, না একটা নূতন বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইবে? এ কথা অর্ব্বাচীনের কথা, ইহার বিচারের কোন আবশ্যকতা নাই।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, এই মিলনের অর্থ এই যে, ইংরাজের যাহা কিছু ভাল, আমরা লইব, আমাদের যাহা কিছু ভাল, তাহা ইংরাজ লইবে এবং উভয়ের যাহা কিছু মন্দ, তাহা বিসর্জন করিতে হইবে। এ কথার অর্থ আমি বুঝিতে পারি না। আমাদের কি ইংরাজের যাহা ভাল, যাহা মন্দ, তাহা কি এমন পৃথকভাবে জাতির জীবনের মধ্যে অবস্থিতি করে যে; একটা একেবারে

ছাড়িয়া দিয়া আর একটা লওয়া যায় ? একটা বিশিষ্ট জাতির ভালমন্দ যে এক সঙ্গে সেই জাতির রক্তমাংসের সঙ্গে জড়ান। খাঁটী ভালটুকু ছিঁড়িয়া লইবে কি করিয়া ? এমন করিয়া ত ছেঁড়া যায় না। একটা জাতির জীবন ত ঠিক ইটের এমারত নয় যে, ঠেকা দিয়া খানিকটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সে দিকটা আবার নূতন ধরণে নূতন উপকরণে গড়িয়া তুলিবে। কোন জাতির সংস্কার অন্য জাতির আদর্শে সম্ভব হয় না। আমাদের যে সব সংস্কারের আবশ্যক, তাহা আমাদের স্বভাব-ধর্ম্মের মধ্যে যে সব শক্তি নিহিত আছে, তাহার বলেই হইবে। বিলাতের সমাজশক্তির বলে আমাদের আবশ্যকীয় সংস্কার সাধিত হইবে না, —হইতেই পারে না। দুইটা জিনিস যেমন আঠা দিয়া জোড়া লাগান যায়, ঠিক তেমনি করিয়া ত বিলাতের ভালটুকু আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে জোড়া লাগান যায় না। এ যে জীবনের লীলা—জীবন বিকশিত হয়, তাহার বিকাশের মধ্যে যাহা নাই, সে ত তাহার সঙ্গে জোড়া লাগে না।

এই কথাটি আর একদিক দিয়া বোঝা যায়। ধরিয়া লও যে, বিলাতের ভালটুকু তুলিয়া আনিয়া আমাদের জীবনের মধ্যে চালাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু তাহার ফলে কি হইবে, বিলাতি সামাজিক প্রথা বা অবস্থা যদি আমাদের মধ্যে চালাইয়া দেওয়া যায়, তবে সেই প্রথা বা অবস্থার যাহা স্বাভাবিক ফল, তাহা ফলিবেই, এবং তাহার ফলে আমাদের দেশের যে বিশিষ্ট রূপ, তাহা নষ্ট হইয়া বাঙ্গালী সমাজ একটি দ্বিতীয় বিলাতি সমাজ হইয়া উঠিবে। এমন করিয়া আর একটা জাতির প্রতিধ্বনি হইয়া উঠিলে আমাদের বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা কোথায় ?

এভাবে যাঁহারা আমাদের দেশে বিলাতি সমাজের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের চেষ্টা করিতে দাও, আমাদের ভীত হইবার কোন কারণ নাই। আমি জানি, বাঙ্গালী জাতির একটা বিশিষ্ট জাতিত্ব আছে, তাহার একটা বিশিষ্ট স্বভাব-ধর্ম্ম আছে, সেই স্বভাব-ধর্ম্ম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশ করিবে, এবং যাহা সেই স্বভাব-ধর্ম্ম বিরুদ্ধ, তাহাকে বাহির করিয়া দিয়া এই সব প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিবে।

তবে এই যে মিলন—যাহাতে অনেকেই বিশ্বাস করেন ও আমিও বিশ্বাস করি, সেই মিলনের যথার্থ মর্ম্ম কি ? এই বিষয়টা দুই দিক দিয়া দেখা যায়, ইহাকে জাতিত্বের দিক দিয়া অর্থাৎ বাঙ্গালী জাতির যে জাতিত্ব ও ইংরাজ জাতির যে জাতিত্ব, এই দুইটি সত্যের দিক দিয়া দেখা যায়। আর একটা

দিক দিয়াও দেখা যায়, সেটা আমাদের নিজ নিজ শাসন-বিভাগ অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের দিক দিয়া।

এই শেষোক্ত দিক্ দিয়া বিচার করিতে হইলে ইহা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, দুইটি স্বতন্ত্র জাতি নিজ নিজ বিশিষ্টরূপেই বিকশিত হইয়াও এই দুটি জাতির শাসনবিভাগের উপর দিকে একটা একচ্ছত্র যোগাযোগ থাকিবে। বাঙ্গালী জাতির ও ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পরস্পরের শাসন-বিভাগের একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে এবং সমস্ত ভারতবর্ষের যে শাসন-বিভাগ, তাহার সহিত ইংলণ্ডের সম্বন্ধ, একটা বাস্তবিক সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিবেই উঠিবে। কিন্তু সেই সম্বন্ধের ভিতরের প্রকৃতি কি হইবে, বাহিরের আকার কি হইবে, তাহা এখনও ঠিক করিয়া বুঝা এবং বলা অসম্ভব। স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ বোম্বাই কংগ্রেসে বলিয়াছিলেন :—

"It seems to me that having fixed our goal it is hardly necessary to attempt to define in concrete terms the precise relation-ship that will exist between England and India when the goal is reached."

অর্থাৎ :—আমাদের যে উদ্দেশ্য, তাহা সম্পূর্ণভাবে সফল হইলে ইংলণ্ডের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে যে ঠিক কি সম্বন্ধ থাকিবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা আমার মতে এখন অনাবশ্যক।

আমার ঠিক তাহাই মনে হয়, তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, এমন সম্বন্ধ হইতে বা থাকিতে পারে না, যাহাতে আমাদের ও ইংরাজের জাতীয় স্বভাব-ধর্ম্মের বিনাশ-সাধন হইবে। শুধু জাতিত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইংরাজ ও বাঙ্গালীর যথার্থ মিলনভূমি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। আমি আগেই বলিয়াছি, দুইটি জাতি যখন নিজ নিজ প্রকৃতির মধ্যে নিজ নিজ স্বভাবধর্ম্মের গুণে উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহাদের মধ্যে যথার্থ আদান-প্রদান ও মিলন সম্ভব হয়। যখন ইংরাজ ও বাঙ্গালী এই উভয় জাতিই সেই প্রকার উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, তখনই তাহাদের মধ্যে প্রকৃত মিলন হইবে। প্রকৃত মিলনের ফল এই যে, শত শত ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্টরূপে বিকশিত স্বতন্ত্র জাতিসমূহ বিধাতার সৃষ্টিস্রোতে ভাসিতেছে, ফুটিতেছে, ইহাদের সকলের মধ্যে যে একটা একত্ব আছে, এই সব ভিন্নরূপের যে স্বরূপ, তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয় না। জাতিত্ব মরে না—শুধু সকল জাতির মধ্যে সকল বিশিষ্টরূপের মধ্যে যে একত্ব আছে, তাহাই জাগিয়া উঠে। এই

জন্যই ইংরাজ এ দেশে আসিয়াছিল। এইখানেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যথার্থ মিলন। এই ক্ষেত্রেই Universal Brotherhood of man সম্ভব। তাই শুধু এই দিক্ দিয়া দেখিলেই দেখা যায়, the East and the West have met not in vain. অর্থাৎ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য যে একত্র হইয়াছে—তাহা ব্যর্থ হইবে না।

এখন দেখা যাইতেছে যে, আমাদের দেশের উন্নতিসাধন করিতে হইলে আমাদের এই নব-জাগ্রত জাতিত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের ইতিহাসের ধারাকে উপলব্ধি করিয়া ও সাক্ষী রাখিয়া আমাদের দেশের সকল দিকের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিতে হইবে এবং সেই আলোচনার ফলে কি কি উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের স্বভাবধর্ম্মসঙ্গত অথচ সার্ব্বভৌমিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

কৃষকের কথা

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার কথা ভাবিতে গেলে প্রথমেই আমাদের কৃষিজীবীদের কথা মনে আসে, তার পরই আমাদের দারিদ্র্যের কথা মনে হয়। কৃষকের কথা ও দারিদ্র্যের কথা একই কথা বলিয়া মনে হয়। আমরা সকলেই জানি যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের অভাবে কৃষিকার্য্যই আমাদের উপজীবিকার প্রধান উপায়। আমরা সকলেই জানি যে, বাঙ্গালী জাতির মত এত দরিদ্র জাতি বোধ হয় জগতের আর কোথাও নাই। কিন্তু ঘোর দারিদ্র্যের প্রকৃত অবস্থা বোধ হয় ভাল করিয়া জানি না, সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারি না। আমরা ত একেবারে এক মুহূর্ত্তে দরিদ্র হইয়া পড়ি নাই—আমরা যে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে কঙ্কালসার হইয়া পড়িয়াছি। তাই এই অতি সত্য যথার্থ অবস্থা আমরা ঠিক ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। বিদেশীরা যখন প্রথম আমাদের দেশে আসে, তখন তাহারা আমাদের সোনা-রূপার প্রাচুর্য্য দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল। সে সোনা-রূপা আসিত কোথা হইতে? বাঙ্গলা দেশে ত সোনা-রূপার খনি নাই। তবেই বলিতে হইবে যে, আমাদের কৃষিকার্য্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্যে আমরা অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতাম।

সরকারী কাগজপত্রে পাওয়া যায় যে, আমাদের সমস্ত জনসংখ্যা ধরিলে এবং আমাদের সমস্ত চাষযোগ্য ভূমি হিসাব করিলে জন পিছে দুই বিঘারও